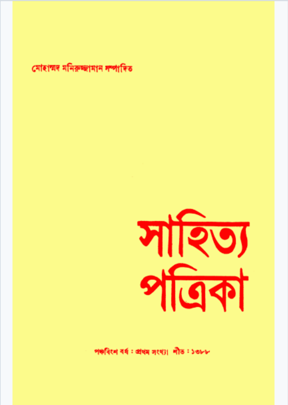

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহার 'মুখবন্ধ'

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.12
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.12
Pages	197-212
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহার 'মুখবন্ধ'

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গালা ভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না। তারপর শুনা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রামমোহন রায় ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালার অনেক বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বিচারের বহিও আছে। ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাঙ্গালা ভাষায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়া-ছিল; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেখাদেখি আরও দুই চারিখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল, কিন্তু সেগুলি সব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস সত্ত্বেও খ্রীষ্টাব্দের ৮০ কোটায়-লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালাটা একটা নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে না, চিন্তা করিয়া নূতন বিষয় লিখা যায় না, লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজী, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড় কটমট হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া আমি অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। সে কালের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবদের একেবারে দেখিতে পারিত না। বিশেষ, চৈতন্যের দলের উপর তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের বাড়ী বৈষ্ণবদের বহি একেবারে দেখা যাইত না। নৈয়ায়িকেরা ত আরও চটা ছিল। সুতরাং আমার অদৃষ্টে বৈষ্ণবদের বহি একেবারে পড়া হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরিতে আসিয়া দেখিলাম, বৈষ্ণবদের অনেক বহি ছাপা হইতেছে; শুধু গানের বহি আর সংকীর্ত্তনের বহি নয়, অনেক জীবন-চরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোলার লাইব্রেরির বাৎসরিক উৎসবে আমি একটি প্রবন্ধ পড়ি। ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাঁহাদের অনেকের জীবন-চরিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করি। সভায় গিয়া দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড় কিছু জানি-তাম না, অধিকাংশ লোকই সেইরূপ; বাঙ্গালায় এত বহি আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য

হইয়া গেলেন, অথচ আমি যে সকল বহির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলই ছাপা বহি, কলিকাতাতেই কিনিতে পাওয়া যাইত। একজন সমালোচক বলিলেন,—"আমি প্রবন্ধ সমালোচনা করিব বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সব কয়খানি ইতিহাস পড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।" আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়াছিলেন,—"আমি যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম।"

এই সকল সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া আমি ভাবিলাম, যদি ছাপা পুথির উপর প্রবন্ধেই এত নূতন খবর পাওয়া গেল, হাতের লেখা পুথি খুঁজিতে পারিলে না জানি কত কি নূতন খবর দিতে পাইব। সুতরাং বাঙ্গালা পুথি খোঁজার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ জন্মিল। সেই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্ত হইল এবং বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার পুথি খোঁজার ভার আমার উপর পড়িল, আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গালা পুথি খুঁজিতে লাগিলাম, ট্রাবেলিং পণ্ডিতদেরও বলিয়া দিলাম, তোমরা বাঙ্গালা পুথির সন্ধান আনিবে এবং পার ত কিনিবে। নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ। সুতরাং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিবে। প্রথমেই তাঁহারা মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল আনিয়া দিলেন। পুথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেজ ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জামিন হইয়া মাসিক ১০ দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে ঐ পুথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী বসিয়া তাহা কপি করাই। খাঁটী ব্রাহ্মণের ছেলে, ন্যায়শাস্ত্রের পড়ুয়া, ধর্ম্মঠাকুরের বহি কেন লেখে এবং কেমন লেখে, জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, তাই এইরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সে পুথিখানি ধার করিয়াছিলাম। সে পুথি বহু দিন হইল, সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া গিয়াছে। আর একখানি পুথি পাইয়াছিলাম—শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিতের লেখা। তাহাতে ধর্ম্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি অনেক আছে এবং তাহার শেষে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামে রামাই পণ্ডিতের একটি লম্বা ছড়া আছে। সে ছড়া পড়িলে ধর্ম্মঠাকুর যে হিন্দু ও মুসলমানের বার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ধর্ম্মঠাকুরের সেবকগণ তাঁহার নিকট উদ্ধার কামনা করিল। তিনি যবন-রূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদের সর্ব্বনাশ করিলেন। রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয় মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বেশী পরেও নয়। মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের জব্দ করিয়াছিল দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুরের দল খুশী হইল, অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। শূন্যপুরাণ সাহিত্য-পরিষদের জন্য নগেন্দ্র বাবু ছাপাইয়াছেন। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমের পর ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল; সেখানি বোধ হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা; কারণ, তাহাতে রাঢ়দেশে বৰ্দ্ধমান ও মঙ্গলকোট প্রধান জায়গা। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহা না বাঙ্গালা, না সংস্কৃত, এক অপরূপ ভাষায় লিখিত। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের শেষে আছে,—"বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।" অর্থাৎ যিনি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চান যে, তাহা রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের এক তত্ত্ব; সুতরাং হিন্দুদিগের একখানি প্রমাণ-গ্রন্থ। উহাতে ধর্ম্মঠাকুরের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। এই পুথিখানি হইতে আরও বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি তত্ত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল।

আমি যখন এইরূপে বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিতেছি, তখন নগেন্দ্র বাবুও আমার মত পুথি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুথি-সংগ্রহ অন্যরূপ, তিনি ঘরে বসিয়া পুথি

কিনিতেন। যাহারা পাড়াগাঁয়ে বটতলার বহি বেচিতে যায়, তারা বইয়ের বদলে পুথি লইয়া আসিত, নগেন্দ্র বাবু তাহাদের নিকট পুথি কিনিতেন। তিনি কত পুথি কিনিয়াছিলেন, জানি না; তবে, তাঁহার পুথিগুলি এখন ইউনিভার্সিটিতে আছে। আমি প্রায় পাঁচ শত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এশিয়াটিক সোসাইটির জন্যই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

এই সময়ে বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহ-বিষয়ে আমার একজন সহায় জুটিয়াছিলেন। কুমিল্লা স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সোসাইটি তাঁহার চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে পূর্ব্ববাঙ্গালায় পুথি খোঁজার সুবিধা হইবে বলিয়া আমি আমার ট্রাবেলিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয়কে এক বৎসরের জন্য দীনেশ বাবুর কাছে রাখিয়া দিই এবং দীনেশ বাবুর কথামত বাঙ্গালা পুথি খরিদ করিতে বলি। আরও বলিয়া দিই যে, দীনেশ বাবু উহা যত দিন ইচ্ছা রাখিতে পারেন। দীনেশ বাবুর সাহায্যে পরাগলির মহাভারত, ছুটি খাঁর অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খরিদ হয়।

যখন ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তখন ধর্ম্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, আমি একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধে সেইটি লিপিবদ্ধ করিলাম। এইরূপ লিপিবদ্ধ করার প্রধান কারণ এই যে, ঐ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া, নেপালে হিন্দুরাজার অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে, দেখিতে যাইব। সে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। প্রবন্ধটি যখন লিখিতেছি, তখন নগেন্দ্র বাবু আমার নৈহাটীর বাড়ীতে যান। কথা ছিল, তিনি আমার সঙ্গে যাইবেন; তাঁহার যাওয়া হইল না, সেই কথা বলিবার জন্য তিনি নৈহাটী যান এবং সেখান হইতে সাহিত্য-পরিষদে দিব বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া আসেন। আসিয়া শুনিলাম, আমার অনুপস্থিতিতে যখন এই প্রবন্ধ পড়া হয়, তখন অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন,—ছিঃ! জেলে মালোরা যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্ম্মঠাকুর কি না বৌদ্ধ! ছিঃ!

যা হোক, আমি নেপাল হইতে আসিয়া "Discovery of Living Buddhism in Bengal" নামে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ ছাপাই। এইবার প্রকাশ্যে বলিয়া দিই, ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ।

আমি মনে করি, বাঙ্গালা পুথি খোঁজার এইটিই প্রথম ও প্রধান সুফল। ইহার দ্বারা আমরা বেশ জানিতে পারি যে, কেন ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আদিশূর রাজা বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়া বসাইবার জন্য রাজারা এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং কেন বাঙ্গালা দেশে কতক-গুলি জাত আচরণীয় এবং কতকগুলি জাত একেবারে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ বাঙ্গালা পুথি খোঁজার আর একটি সুফল হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি দুই বার নেপালে যাই, তখন কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। উহার মধ্যে মধ্যে একরূপ নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে; হয় সেগুলি সংস্কৃতে যাহা লেখা আছে, তাহারই প্রমাণস্বরূপ, অথবা মূলটাই সেই ভাষায় লিখিত, টীকা সংস্কৃত। ডাকার্ণব নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহার মাঝে মাঝে এইরূপ নূতন ভাষায় অনেক লেখা আছে। ডাকার্ণব নাম শুনিয়াই আমি মনে করিলাম, সেগুলি ডাক-পুরুষের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া উহার একখানি নকল লইয়া আসি। পড়িয়া

দেখি, সে বাঙ্গালা নয়, কি ভাষায় লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আর একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নাম, 'সুভাষিত-সংগ্রহ', উহারও মধ্যে মধ্যে একটি নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে এবং আর একখানি পুস্তক দেখিলাম—'দোঁহাকোষ পঞ্জিকা'।

'সুভাষিত-সংগ্রহ'খানি বেণ্ডল সাহেব নকল করিয়া লইলেন এবং 'দোঁহাকোষ পঞ্জিকা'খানি আমি নকল করিয়া লইলাম। বেণ্ডল সাহেব 'সুভাষিত-সংগ্রহ' খানি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার সময় আমার দোঁহাকোষ-পঞ্জিকাখানি লইয়া যান, আমি সেখানি আর ফিরিয়া পাই নাই। পরে শুনিতে পাইলাম, যে পুথিখানি হইতে আমার দোঁহাকোষ-পঞ্জিকা নকল হইয়াছিল, তাহা জাপানে চলিয়া গিয়াছে। ১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়', উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম ''চর্য্যাপদ''। আর একখানি পুস্তক পাইলাম—তাহাও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম সরোরুহবজ্র, টীকাটি সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নামও দোঁহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে।

বেণ্ডল যে সুভাষিত-সংগ্রহ ছাপাইয়াছেন, তিনি তাহার পরিশিষ্টে এই নূতন ভাষার আটাশটি দোঁহা টীকাটিপ্পনী সমেত দিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ ভাষা একটি প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষা, তাহার একটি দোঁহা এখানে দিতেছি।

> গুরু উবএসো অমিঅরসু হবহিং ন পিঅউ জেহি।
> বহুসত্থমরুত্থলিহিঁ তিসিএ মরিথউ তেহি। [পত্রাঙ্ক ১০২]

বেণ্ডল সাহেবের পাঠ একটু আলাদা রকমের—

> গুরু উবএসহ অমিঅ রসু হবহি ণ পীউ জেহি
> জহ সত্থে(ণ)মরুত্থলিহিং তিসিত মরিউ তেহি।

প্রফেসর বেণ্ডল তাঁহার প্রথম পরিশিষ্টে এক বার বলিয়াছেন, ঐগুলি অপভ্রংশ ভাষা, আর এক বার বলিয়াছেন, বৌদ্ধ প্রাকৃত ভাষা এবং চতুর্থ পরিশিষ্টে শুদ্ধ প্রাকৃত শব্দে উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এ ভাষাটি যে কি, তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাস্তবিক প্রাকৃত অপভ্রংশ পালি প্রভৃতি শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেই তাহাকে প্রাকৃত বলে। অশোকের শিলালিপিও প্রাকৃত, পালিও প্রাকৃত, জৈনপ্রাকৃতও প্রাকৃত, নাটকের প্রাকৃতও প্রাকৃত, বাঙ্গালাও প্রাকৃত, মারাঠীও প্রাকৃত। প্রাকৃত ব্যাকরণে যে ভাষা কুলায় না, তাহাকে অপভ্রংশ বলে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন,—ভাষা চার রকম ;—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। দণ্ডী কোন্ কালের লোক, তাহা জানি না, তবে তিনি যে খ্রীঃ ৬ শতকের পূর্ব্বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মহারাষ্ট্র ভাষাকে ভাল প্রাকৃত বলিয়াছেন এবং সেই ভাষায় লিখিত 'সেতুবন্ধ কাব্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে ভাষার আর এক রকম ভাগ আছে। উহাতে বলে,—সংস্কৃত ছাড়া দুইটা ভাষা আছে, ভাষা আর বিভাষা। তিনি মহারাষ্ট্র ভাষার নাম করেন না, দাক্ষিণাত্য, অবন্তী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতিকে ভাষা বলেন, আর আভীরী, সৌবীরী প্রভৃতিকে বিভাষা বলেন। তিনি প্রাকৃত একটা ভাষা বলেন না, উহাকে পাঠ বলেন। সংস্কৃত পাঠ ও প্রাকৃত পাঠ। সুতরাং যখন নাট্যশাস্ত্র লেখা হয়, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল, ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা, যেগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নয়, সেগুলি বিভাষা। তিনি বলিয়াছেন,—

বিভাষাও নাটকে চলিতে পারে, কিন্তু অন্ধ্র, বাহ্লীক প্রভৃতি ভাষা একেবারে চলিবে না। ভরতনাট্যশাস্ত্রে ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ভয়ানক মতভেদ দেখা যায়। বররুচি 'প্রাকৃত-প্রকাশে' মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী, চারিটি ভাষা প্রাকৃত বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহারাষ্ট্রীর প্রকৃতি সংস্কৃত, সৌরসেনীর প্রকৃতি মহারাষ্ট্রী, পৈশাচীর প্রকৃতি সৌরসেনী। আরও অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে। যিনি যখন প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, কতকগুলি প্রাকৃত বহি লইয়া একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন এবং যাহার সহিত মিলিবে না তাহাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন। এইরূপে যে কত অপভ্রংশ ভাষা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাই রাগ করিয়া বুঁদির রাজার চারণ সুরজমল বলিয়া দিয়াছেন, যে ভাষায় বেশী বিভক্তি নাই, সেই অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অধিকাংশ চলিত ভাষায় বিভক্তি নাই, তারা সবই অপভ্রংশ। প্রফেসর বেণ্ডল এই নূতন ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম। আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশের লোক। অনেকে যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়। এ সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল এবং সে তর্জ্জমা তেঙ্গুরে* আছে। প্রফেসর বেণ্ডল দুই চারি জায়গায় ঐ তর্জ্জমা ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরাজী ৭ হইতে ১৩ শতের মধ্যে তিব্বতীরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জ্জমা করিত, শুদ্ধ সংস্কৃত কেন, ভারতবর্ষের সকল ভাষার বহি তর্জ্জমা করিত, অনেক সময়ে তাহারা তর্জ্জমার তারিখ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে এই বাঙ্গালা বহিগুলি ৭ শত হইতে ১৩ শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জ্জমা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৮।৯।১০।১১।১২ শতে এই সকল বহিগুলি লেখা হইয়াছিল বলা যায়। প্রফেসর বেণ্ডল কয়েকটি দোঁহা মাত্র পাইয়াছিলেন, আমি দুইখানি দোঁহাকোষ পাইয়াছি, একখানিতে তেত্রিশটি দোঁহা আছে, আর একখানিতে প্রায় এক শতটি আছে। শেষোক্ত দোঁহাখানির সর্ব্বত্র মূল নাই। টীকার মধ্যে অনেক স্থলে পুরা দোঁহাটি ধরিয়া দেওয়া আছে, অনেক স্থলে কেবল আদ্যক্ষর ধরিয়া দেওয়া আছে। তবে ১০০ এক শতের অধিক হইবে ত কম হইবে না। দোঁহাগুলিতে গুরুর উপর ভক্তি করিতে বড়ই উপদেশ দেয়। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না। একটি দোঁহায় বলিয়াছে,—গুরু বুদ্ধের অপেক্ষাও বড়। গুরু যাহা বলিবেন, বিচার না করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে। সরোরুহপাদের দোঁহাকোষে এবং অদ্বয়বজ্রের টীকায় ষড়্দর্শনের খণ্ডন আছে। সেই ষড়্দর্শন কি কি? ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাঙ্খ্য। জাতিভেদের উপর গ্রন্থকারের বড় রাগ। তিনি বলেন,—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক্; যদি বল, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েওত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে! আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্য লোকে দিক না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক, না হোক ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্ব্ববেদের সত্তাই নাই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, স্থতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নাই। বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ ত আর শূন্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।

যাহারা ঈশ্বরধর্ম্ম মানে, তাহাদের সম্বন্ধে সরোরুহবজ্র বলেন,—ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান কোণে

***তিব্বত দেশের লোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের অনেক বৌদ্ধ এবং হিন্দুপুস্তক তর্জ্জমা করে। এই সকল পুস্তকের দুইটি ভাগ আছে। যাহাতে বুদ্ধের বচন আছে, তাহাকে "কেঙ্গুর" বলে, অবশিষ্ট সমস্তের নাম "তেঙ্গুর"।**

বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিট্‌মিট্ করে, কানে খুসখুস করে ও লোককে ধাঁধা দেয়। অনেক 'রণ্ডী' 'মুণ্ডী' এবং নানাবেশধারী লোক এই গুরুর মতে চলে। কিন্তু যখন কোন পদার্থই নাই, যখন বস্তুই বস্তু নয়, তখন ঈশ্বরও ত বস্তু, তিনি কেমন করিয়া থাকেন। ব্যাপকের অভাবে ত ব্যাপ্য থাকিতে পারে না। বলিবে, কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বস্তুই নাই, তখন ঈশ্বর কি করিবেন?

ক্ষপণকদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়। নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল-কুকুরের মুক্তি আগে হইবে। যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি হয়, তাহা হইলে অনেক পদার্থের মুক্তি হইবে। ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে হাতী-ঘোড়াকে ত ময়ুরপুচ্ছ দিয়া সাজায়, তাহা হইলে তাদের আগে মুক্তি হওয়া উচিত। সরোরুহপাদ আরও বলেন—ক্ষপণকদের যে মুক্তি, সে আমার কিছুই বলিয়া মনে হয় না। তাহারা তত্ত্ব জানে না, তাহারা জীব বলিয়া যে পদার্থ মানে, সে জীব জীবই হইতে পারে না, সকলই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সকলই ভ্রান্তি। তাহারা বলে,—মোক্ষ নিত্য, কিন্তু এ কথা হইতেই পারে না; কারণ, তাহারা বলে, ব্রহ্মাণ্ডের উপর মোক্ষ ছত্রাকারে ছিয়াশী হাজার যোজন ব্যাপিয়া আছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড ত অনিত্য, তাহার ত নাশ আছে, ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইলে ছত্র কোথায় থাকিবে? মোক্ষ লোপ হইয়া যাইবে।

শ্রমণদের সম্বন্ধে সরোরুহ বলেন,—যে বড় বড় স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য, সকলেই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহারা হীনযান, তাহাদের যদি শীলভঙ্গ হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ নরকে যায়। যাহারা শীল রক্ষা করে, তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, মোক্ষ হইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে, তাহাদেরও মোক্ষ হয় না; কারণ তাহারা কেহ কেহ সূত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত, সে সকল নূতন ব্যাখ্যায় কেবল নরকই হয়। কেহ পুস্তক লেখে, কিন্তু পুস্তকের অর্থ জানে না, সুতরাং তাহাদের নরকই হয়। সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।

এখানে পুথির একটি পাতা না থাকায় সরোরুহ কি প্রকারে লোকায়ত ও সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। তিনি বলেন,—সহজ-মতে না আসিলে মুক্তির কোন উপায় নাই। সহজ-ধর্ম্মে বাচ্য নাই, বাচক নাই এবং ইহাদের সম্বন্ধও নাই। যে যে-উপায়ে মুক্তির চেষ্টা করুক না কেন, শেষ সকলকে সহজ পথেই আসিতে হইবে। তিনি বলেন,—মানুষ আপনার স্বভাবটাই বুঝে না। ভাবও নাই, অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ব্বাণে কোনও প্রভেদ নাই। দু-ই এক, সুতরাং সহজিয়ারা অদ্বয়বাদী। মানুষের স্বভাব যদি এই হইল, তখন তাহাকে বদ্ধ করে কে? সরোরুহপাদের শেষ দুইটি দোঁহা এই;—

পর অপ্পাণ ম ভত্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
এহুসো নিম্মল পরম পউ চিত্ত সহাবেঁ সুদ্ধ॥

আপনি ও পর, এ ভ্রান্তি করিও না (দু-ই এক); সকলই নিরন্তর বুদ্ধ, এই সেই নির্ম্মল পরমপদ্মরূপ চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ।

অদ্বঅচিত্ত তরুঅর ফরাউ তিহুঅণেঁ বিস্থা [র]
করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরই ণামে পর উআর। [পত্রাঙ্ক ১১৯]

অদ্বয় চিত্ততরু ত্রিভুবনে বিস্তৃত হইয়া স্ফূর্ত্তি পায়, তখন করুণার ফুল ফোটে এবং ফল ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকার।

যত দূর সংক্ষেপে পারিলাম, সরোরুহবজ্রপাদের দোঁহা ও অদ্বয়বজ্রের টীকার মূল কথা গুলি বলিয়া দিলাম। সহজিয়া ধর্ম্মের যত বই আছে, সকলেরই মূল কথা ঐ এক, কিন্তু ইহাতে একটি মুস্কিল আছে; সেটি এই যে, সহজিয়া ধর্ম্মের সকল বইই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষায় মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উচু অঙ্গের ধর্ম্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি, সাহিত্যের কথাই কহিব।

এখন এই যে ভাষা, যাহাকে আমি বাঙ্গালা বলিতেছি, ইহা বাঙ্গালা কি না? সরোরুহ-বজ্রের দুইটা দোঁহা দিয়াছি, একটা গান দিই। এই গানটি চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয় নামক সহজিয়া গ্রন্থে আছে। সরোরুহ শব্দ বাঙ্গালায় সরহ হয়, এই গানের ভণিতায়ও সরহ আছে—

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ-অপনা ।। ধ্রু ।।
অম্ভে ন জাণঁহু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ।। ধ্রু ।।
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো ।। ধ্রু ।।
জাএথু জাম মরণ বিসঙ্কা
সো করউ রস রসাণেরে কংখা ।। ধ্রু ।।
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি ।। ধ্রু ।।
জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ।। ধ্রু ।। (পত্রাঙ্ক ৩৮)

লোক মিথ্যা মিথ্যা আপনার মনে মনে ভব ও নির্ব্বাণ রচনা করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতেছে। আমরা কিন্তু অচিন্ত্য যোগী, আমরা জানি না, জন্ম-মরণ এবং ভব কিরূপ হয়। জন্মও যেমন, মরণও তেমনি, জীবন ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এ ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সেই রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগীরা সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না। সরহ বলে,—জন্ম হইতে কর্ম্ম হয়, কি কর্ম্ম হইতে জন্ম হয়, সে কথা স্থির করা যোগীদিগের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিখানায় ৯৯৯০ নম্বরে তিনখানি তালপাতা আছে, উহাতে শান্তিদেবের জীবন-চরিত দেওয়া আছে। তালপাতাগুলি নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত, অক্ষরের আকার দেখিয়া বোধ হয়, ইংরাজী ১৪ শতকে লেখা হইয়াছিল। শান্তিদেব একজন রাজার ছেলে। যে দেশের রাজা, সে দেশের নামটি পড়া যায় না। রাজার নাম মঞ্জুবর্ম্মা। তারানাথ বলেন,—শান্তিদেব সৌরাষ্ট্রের রাজার ছেলে। বেণ্ডল সাহেবও তাহাই বলিয়াছেন। এ কথা কিন্তু আমার ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পরে প্রকাশ হইবে। রাজা শান্তিদেবকে যুবরাজ করিবার ইচ্ছা করিলেন। শান্তিদেবের মা উহাকে বলিলেন,—তুমি যুবরাজ হও

ও পরে রাজা হও, ক্রমেই পাপে ডুবিবে। তুমি যদি ভাল চাও, নিজের উন্নতি চাও, যে দেশে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বেরা আছেন, সেই দেশে যাও। তুমি যদি মঞ্জুবজ্রের কাছে উপদেশ লইতে পার, তোমার ধর্ম্মে উন্নতি হইবে। এই কথা শুনিয়া শান্তি একটি সবুজ ঘোড়ায় চড়িয়া আপন দেশ ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া তিনি ঘোড়ার উপরেই রহিলেন, আহার-নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। এক দিন একটি নিবিড় বনের মধ্যে একটি সুন্দরী বালিকা তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিল এবং তাঁহাকে নামিতে বলিল। সে তাঁহাকে ভাল জল খাইতে দিল এবং পাঁঠার মাংস খাওয়াইয়া দিল। পরিচয়ে জানা গেল, সে মেয়েটি মঞ্জুবজ্রসমাধির শিষ্যা। মঞ্জুবজ্রের নাম শুনিয়াই শান্তিদেব শিহরিয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—আমি উঁহারই নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছি। তখন উভয়ে মঞ্জুবজ্রের নিকট গেলেন। শান্তিদেব তাঁহার নিকট বার বৎসর রহিলেন এবং মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলেন। বার বৎসরের পর তাঁহার গুরু বলিলেন, তুমি মধ্যদেশে যাও। শান্তিদেব মধ্যদেশে গিয়া মগধের রাজার রাউত হইলেন। রাউত শব্দ এখন প্রচলিত নাই। পূর্ব্বে এ কথাটি বেশ চলিত ছিল, উহার অর্থ সেনাপতি। আমাদের দেশের গন্ধবেণেদের চারিটি আশ্রম আছে, তাহার মধ্যে একটি রাউত আশ্রম অর্থাৎ রাউতাশ্রমের বেণেরা শুধু ছাউনিতে মসলা বিক্রয় করিত। অনেক বড় বড় নগরে রাউতপাড়া নামে একটি পাড়া থাকিত। রাউত হইয়া শান্তিদেবের নাম হইল অচলসেন। তাঁহার একখানি দেবদারু কাঠের তরবারি ছিল, তিনি সে তরবারি কাহাকেও দেখাইতেন না। ক্রমে তিনি রাজার একজন প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, অন্যান্য রাউতেরা তাঁহার হিংসা করিতে লাগিল, ক্রমে তাহারা টের পাইল যে, অচলসেনের তরবারি কাঠের। তাহারা রাজাকে বলিল—আপনি অচল-সেনকে এত ভালবাসেন, ওর তরবারি ত কাঠের, ও কি করিয়া যুদ্ধ করিবে ? তাই শুনিয়া রাজা এক দিন হুকুম দিলেন, আমি সকলের তরবারি পরীক্ষা করিব। সকলেই তরবারি দেখাইল, অচলসেন কিছুতেই রাজি হইল না। রাজা জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, আমার তলয়ারের তেজে আপনি অন্ধ হইয়র যাইবেন। যদি নিতান্ত দেখিতে চান, একটি চক্ষু বাঁধিয়া রাখুন, অপর চক্ষে দেখুন। রাজা তাহাই করিলেন, তাঁহার একটি চক্ষু কাণা হইয়া গেল। রাজা খুব খুশী হইলেন এবং অচলসেনের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু অচলসেনের আর রাউতগিরি করা হইল না। সে পাথরের উপর আছড়াইয়া তলয়ারখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, রাউতের বেশ ত্যাগ করিল এবং নালন্দায় গিয়া ভিক্ষু হইল। সে নালন্দার এক প্রান্তে একখানি কুঁড়ে করিল এবং সেইখানেই বাস করিতে লাগিল। সে ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা শুনিত এবং যোগ করিত। সে সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিত, তাই লোকে তাকে শান্তিদেব বলিত। নালন্দার সঙ্গে তাহার আর একটি নাম হইয়াছিল ভুসুকু ; কারণ, "ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ সুপ্তোপি কুটিং গতোপি তদেবেতি ভুসুকুসমাধিসমাপন্নত্বাৎ ভুসুকুনামখ্যাতিং সঙ্ঘেহপি।" অর্থাৎ ভোজনের সময় তাঁহার মূর্ত্তি উজ্জ্বল থাকিত, শয়নের সময় উজ্জ্বল থাকিত এবং কুটিতে বসিয়া থাকিলেও উজ্জ্বল থাকিত।

এইরূপে বহু দিন যায়। শান্তিদেব কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না, আপন মনে আপন কাজ করিয়া যাইতেন, কিন্তু ছেলেগুলা তাঁহার সহিত দুষ্টামি আরম্ভ করিল। অনেকের সংস্কার হইল, তিনি কিছু জানেন না, সুতরাং এক দিন তাঁহাকে অপ্রস্তত করিতে হইবে। নালন্দায় রীতি ছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমীতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, নালন্দার বড় বিহারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ছিল, পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য সেই ধর্ম্মশালা সাজান হইত। সব পণ্ডিতেরা সেখানে আসিতেন এবং অনেক লোক শুনিতে আসিত। যখন সভা বসিয়াছে, পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন, সব প্রস্তুত, ছেলেরা ধরিয়া বসিল,—শান্তিদেব, তোমায় আজ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শান্তি যতই গররাজি হন, ছেলেরা ততই জিদ করে, শেষে উহারা তাঁহাকে ধরিয়া বেদিতে বসাইয়া দিল। তাহারা মনে করিল, এ একটি কথাও কহিতে পারিবে না, আমরা হাসিব ও হাততালি দিব। শান্তিদেব গম্ভীরভাবে

বসিয়া বলিলেন,—"কিম্ আর্ষং পঠামি অর্থার্ষং বা।" শুনিয়াই পণ্ডিত সকল স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা আর্ষ শুনিয়াছেন, অর্থার্ষ শুনেন নাই। তাঁহারা বলিলেন—এ দুয়ে প্রভেদ কি? শান্তিদেব বলিলেন,—পরমার্থজ্ঞানীর নাম ঋষি অর্থাৎ তিনি বুদ্ধ এবং জিন; তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আর্ষ। যদি বল, সুভূতি প্রভৃতি শিষ্যেরা উপদেশ দিয়াছেন যে সকল গ্রন্থে, তাহা কেমন করিয়া আর্ষ হইল? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যুবরাজ আর্য্য মৈত্রেয় বলিয়া গিয়াছেন;—

যদর্থবদ্ধর্ম্মপদোপসংহিতং ত্রিধাতুসংক্লেশনিবর্হণং বচঃ।
ভবে ভবেচ্ছান্তমনুশংসদর্শকং তদ্বৎ ক্রমার্ষং বিপরীতমন্যথা॥

অতএব আর্ষ গ্রন্থ হইতে পণ্ডিতগণ যাহা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাই অর্থার্ষ আর সুভূতি প্রভৃতির যে উপদেশ, তাহা আর্ষ, যেহেতু ভগবান্ তাহার অধিষ্ঠাতা। পণ্ডিতেরা বলিলেন,—আমরা আর্ষ অনেক শুনিয়াছি, তোমার কাছে কিছু অর্থার্ষ শুনিব।

ইতিপূর্ব্বেই শান্তিদেব বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় নামে তিনখানি অর্থার্ষ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিলেন, শেষ বোধিচর্য্যাবতার পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই পাঠ আরম্ভ হইল, বোধিচর্য্যার ভাষা অতি সুললিত, যেন বীণার সুরে বাঁধা, ভাব অতি গভীর, সংক্ষিপ্ত ও মধুর। পণ্ডিতেরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ছেলেরা মনে করিয়াছিল, লোকটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহারা ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন পাঠ জমিতে লাগিল, যখন মহাযানের গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, যখন শান্তি মধুরস্বরে—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি॥

ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন, হঠাৎ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, আর উজ্জ্বলবর্ণ বিমানে চড়িয়া, শরীর-প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া মঞ্জুশ্রী নামিতে লাগিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইল, তিনি শান্তিদেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিমানে তুলিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। পরদিন পণ্ডিতেরা তাঁহার কুটিতে গিয়া বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সূত্র-সমুচ্চয় তিনখানি পুথি পাইলেন ও তাহা প্রচার করিয়া দিলেন। এই তিনখানির দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, কেবল সূত্র-সমুচ্চয় পাওয়া যায় নাই। যে দুইখানি পাওয়া গিয়াছে তাহা ছাপানও হইয়াছে। শান্তিদেব ও ভুসুকু যে এক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যেমন সরহপাদের কতকগুলি গান দিয়াছি, সেইরূপ ভুসুকুপাদেরও কতকগুলি গান আছে। গানের ভুসুকু ও শান্তিদেব এক কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ। কারণ, গানগুলি সহজযানের ও পুথিগুলি মহাযানের। কিন্তু শিক্ষা-সমুচ্চয়ের ভূমিকায় বেণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন যে, এ পুস্তকে তান্ত্রিক মতের কথা আছে। কিন্তু সে অতি অল্প। এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিখানায় ৪৮০১ নম্বরের যে পুথি আছে, তাহাও ভুসুকুপাদের লেখা। এই পুথিখানি সম্পূর্ণ নহে, সাতটি মাত্র পাতা, কিন্তু এখানা পুরামাত্রায় সহজযানের পুথি। ইহাতে সহজিয়াদিগের কুটি-নির্ম্মাণ, ভোজন-বিধি, শয়ন-বিধি প্রভৃতি নানা বিধি আছে। ইহাতে মদ খাওয়া ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারেরও ত্রুটি নাই। ইহাতেও বাঙ্গালা ছড়া আছে, এই পুথির অক্ষরও খুব প্রাচীন। ইহা হইতে একটি বাঙ্গালা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

রবিকলা মেলহ, শশিকলা বারহ, বেণি বাট বহন্ত।
তোড়হ সমস্তা সমরস জাউ ন জায়তে কাগণ জগফলা খায়॥

আরও— অম্বু পসরতু চন্দন বারহ অক্কহেঠে কমল করি শয়ন অঙ্ক।
সুরচাপি শশি সমরস জায় রাউত বোলে জরমরণ ভয়।
বেঅদণ্ড চউদ্দ চর্য্যহ সুরকায় চ্ছাড়ি ন যাই
সো দুর যোগীএ ন জানহ খোজ গুরু নিন্দা করি যোগ।

শান্তিদেব যে শান্তিদেব নামেই একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আমরা তেঙ্গুর হইতে পাইয়াছি। সে গ্রন্থখানির নাম শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্র-বলিবিধি। এইখানে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ী ছিল জাহোর। জাহোর কোথায়, জানা যায় না। কিন্তু পদকর্ত্তা রাউত ভুসুকুর বাড়ী যে বাঙ্গালায় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে ভুসুকুর একটি গান আছে; সেটি এই,—

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥ ধ্রু ॥
ডহিজো পঞ্চধাটণ ইদিবিসংজ্ঞা ণঠা
ণ জানমি চিঅ মোর কঁহি গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
সোণ তরুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥ধ্রু ॥
চউকোড়ী ভণ্ডার মোর লইআ সেস
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥ [পত্রাঙ্ক ৭৩]

বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মাখালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গাল দেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভুসু, আজ তুই সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলি, যেহেতু নিজ ঘরিণীকে চণ্ডালী করিয়া লইলি।

[সহজ-মতে তিনটি পথ আছে;—অবধূতী, চণ্ডালী, ডোম্বী বা বঙ্গালী। অবধূতীতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে, চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান আছে বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়, কিন্তু ডোম্বীতে কেবল অদ্বৈত; দ্বৈতের ভাঁজও নাই। বাঙ্গালায় অদ্বৈত মত অধিক চলিত, সেই জন্য বাঙ্গালা অদ্বৈত মতের যেন আধারই ছিল। গ্রন্থকার এখানে বলিতেছেন,—রে ভুসু, তোমার নিজ ঘরিণী যে অবধূতী ছিল, তাহাকে চণ্ডালী করিয়া লইলে, এইবার তুমি সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলে অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈত হইলে।]

তুমি মহাসুখরূপ অনলের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত সমস্ত দগ্ধ করিয়াছে। তোমার ইন্দ্রিয়-বিষয় ও সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে। এখন জানি না, আমার চিত্ত কোথায় গিয়া পঁহুছিল, আমার শূন্য তরুর কিছুই রহিল না। সে আপন পরিবারে মহাসুখে থাকিল, আমার চার কোটি ভাণ্ডার সব লইয়া গেল, এখন জীবনে ও মরণে কিছুই বিশেষ নাই। রাউতের আর একটি গান এই;——

আইএ অণুঅনাএ জগ রে ভাংতি এঁসো পড়িহাই
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই ॥ ধ্রু ॥
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহ্না
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোরা ॥ ধ্রু ॥
মরুমরীচিগন্ধনইরীদাপতি বিম্বু জইসা
বাতাবত্তেঁ সো দিট ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥

বাঁন্ধি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধ খেড়া
বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশ ফুলিলা ।। ধ্রু ।।
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব
জই তো মুঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব ।। ধ্রু ।। [পত্রাঙ্ক ৬৩]

জগৎ যে অনুৎপন্ন, পরমার্থজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা এ কথা জানেন। তাঁহারা জানেন যে, জগৎকে সৎ বলা ভ্রান্তি মাত্র। দড়িকে রাজসাপ বলিয়া যাহারা চমকিয়া উঠে, সত্য সত্যই বোড়া সাপে কি তাহাদের খায়? ভ্রম গেলেই সত্য প্রকাশ হয়। কি আশ্চর্য্য, হে বাল-যোগিন্, ইহাতে হাত লোনা করিও না, যদি জগতের শূন্যস্বভাব অবগত হও, তাহা হইলে তোমার বাসনা দূর হইবে। মরীচিকা, গন্ধর্ব্ব-নগর, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেরূপ, জগৎও সেইরূপ। বাতাবর্ত্তে দৃঢ় হইয়া জল যেমন পাথর হয়, জগৎও সেইরূপ। জগৎ বন্ধ্যা স্ত্রীলোক, তিনি পুত্রবতীর ন্যায় কেলি করেন ও বহুবিধ খেলা দেখান। বালি হইতে তেল বাহির করেন, শশকের শৃঙ্গ বাহির করেন ও আকাশে ফুল ফোটান। রাউতু বলেন,—কি আশ্চর্য্য, ভুসুকু বলেন,—কি আশ্চর্য্য। সকলেরই একই স্বভাব। রে মূর্খ! তোর যদি ভ্রান্তি থাকে, তবে সদ্‌গুরুর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা কর।

কৃষ্ণাচার্য্যের একখানি পুস্তক আছে, তাহার নাম দোঁহাকোষ। উহাতে তেত্রিশটি দোঁহা আছে। প্রথম দোঁহাটি এই ;—

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউ পরমথে পবিন
কোটিহ মাহ এক জত হোই নিরঞ্জনলীণ ।।

২য়—
আগমবেঅপুরাণে পণ্ডিত্ত মান বহন্তি
পক্কসিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভূময়ন্তি ।। [পত্রাঙ্ক ১২৩]

৩০শ—
বুঝি অবিরল সহজ সুণ কাহি বেঅপুরাণ
তোনো তোলিঅ বিষয় বিঅপ্প জগু রে অশেষ পরিমাণ ।।

৩১শ—
জে কিঅ নিচচল মণ রঅণ ণিঅ ঘরণী লই এথো।
সো বাজিরণাহুরে মরি বুত্ত পরমথো ।। [পত্রাঙ্ক ১৩২]

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে কাহ্নু পাদের অনেকগুলি গান আছে।—

জো মণ গোএর আলাজালা
আগম পোথী ইষ্টা মালা ।। ধ্রু ।।
ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জায়
কাঅবাক্‌চিঅ জসু ণ সমায় ।। ধ্রু ।।
আলে গুরু উএসই সীস
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস ।। ধ্রু ।।
জে তই বোলী তে তবি টাল
গুরু বোধসে সীসা কাল ।। ধ্রু ।।
ভণই কাহ্নু জিনরঅণ কিকসই সা
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ।। ধ্রু ।। [পত্রাঙ্ক ৬১]

বিকল্পজাল যে মনের গোচর, আগম, পুথি, ইষ্টদেবের মালা যে মনের গোচর, সে মন কেমন করিয়া সহজকে বুঝাইয়া দিবে? কারণ, কায়, বাক্, চিত্ত সহজের ব্যাখ্যা করিতে

সমর্থ হয় না। গুরু যদি শিষ্যকে সহজ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা বৃথা ; কারণ, যে জিনিষ বাক্‌পথাতীত, তাহাকে কেমন করিয়া কথায় বুঝাইবে? যে সে-বিষয়ে কিছু বলে, সে টালিয়া দেয় মাত্র। গুরু বুঝিল, শিষ্য কালা, সুতরাং তাহাকে বুঝান যায় না। কাহ্নু বলেন,—কালা যেমন বোবাকে বুঝায়, সেইরূপে জিনরত্ন বুঝিতে হয়।

এই কৃষ্ণাচার্য্য এককালে এ অঞ্চলের একজন অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, তাঁহার বিস্তর গ্রন্থ আছে। তাঁহার দোঁহাকোষ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহার গানগুলির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি হেরুক হেবজ্র প্রভৃতি দেবতার তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে অনেক বহি লিখিয়াছেন ও তাহার টীকা লিখিয়াছেন। ইনি একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধাচার্য্যদিগের যিনি আদি, তাঁহার কথা কিছু বলা চাই, তিব্বতদেশে এখনও সিদ্ধাচার্য্য-গণের পূজা হইয়া থাকে। তাঁহাদের সকলেরই মাথায় জটা আছে এবং তাঁহারা প্রায় উলঙ্গ থাকেন। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের মতে লুই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধাচার্য্য। ঐ গ্রন্থে তাঁহার অনেকগুলি গান আছে, একটি দিলাম ;—

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি আই॥
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লাহুরে পাস॥
ভণই লুই আম্‌হে সাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পণ্ডি বইঠা॥ [পত্রাঙ্ক ১]

দেহ তরুবর, তাহাতে পাঁচটি ডাল আছে। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করিল ; লুই বলেন—মহাসুখের পরিমাণ দেখিয়া, উহা কি, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও। যত রকম সমাধি আছে, তাহার দ্বারা কি হইবে? সে সকল সমাধি করিলে সুখ ও দুঃখে নিশ্চয়ই মারা যাইবে। ছন্দের বন্ধন ও করণের পরিপাটী পরিত্যাগ করিয়া শূন্যপক্ষরূপ ভিত্তিকে লইয়া আইস। লুই বলিতেছেন,—আমি পণ্ডিতের বচনানুসারে দেখিয়াছি, ধমণ ও চমণ অর্থাৎ আলি ও কালি, এই উভয়ে আসন করিয়া আমার দেবতা বসিয়া আছেন।

তেঙ্গুরের যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা দেশের লোক, তাঁহার আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে। তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেরও তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার একখানি গ্রন্থে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছেন। সে গ্রন্থখানির নাম অভিসময়বিভঙ্গ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।

লুই আচার্য্যের শিষ্যপরম্পরায় সিদ্ধাচার্য্য হইতেন, তন্মধ্যে দারিক নামে একজন লুইকে আপনার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

সুনকরুণরি অভিন বারেঁ কাঅবাক্‌চিঅ।
বিলসই দারিক গঅণর্ত পারিম কুলেঁ॥

অলক্ষলখচিত্তা মহাসুহে।
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ ।।
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুহলীণে দুলখ পরমনিবাণেঁ ।।
দুঃখেঁ সুঃখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তরমাণী ।।
রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লুই পাঅপত্র দারিক দ্বাদশ ভূঅণে লধা ।। [পত্রাঙ্ক ৫২]

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের বংশে তিলপাদ নামে আর একজন সিদ্ধাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সহজিয়া গান লিখিয়া গিয়াছেন। যে সকল গান পূর্ব্বে তুলিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, এগুলি কীর্ত্তনেরই পদ। সে কালেও সংকীর্ত্তন ছিল এবং সংকীর্ত্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্ত্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন 'চর্য্যাপদ' বলিত। এত ক্ষণে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে আপনাদের বোধ হইবে যে, বৌদ্ধেরাই বুঝি সে কালে গান লিখিত। কিন্তু নাথেরাও সে কালে বাঙ্গালা লিখিত। মীননাথের একটি কবিতা পাইয়াছি, এখানে তুলিয়া দিলাম ;——

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ।। [পত্রাঙ্ক ৩৮]

এ বাঙ্গালা কবিতাটি মীননাথের। অন্যান্য নাথেরা যে বাঙ্গালায় বহি লিখিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। তবে এই দাঁড়াইল যে, খ্রীষ্টীয় ৯ শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুই সহজ-ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময় তাঁহার চেলারা অনেকে সংকীর্ত্তনের পদ লেখে ও দোঁহা লেখে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অথচ তাহার একটু আগেই নাথেরা নাথপন্থ নামক ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহারও অনেক বহি ও কবিতা বাঙ্গালায় লেখা। নাথও অনেকগুলি ছিলেন, কেহ বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, কেহ কেহ হিন্দু হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন। যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে গোরক্ষনাথ একজন। তারানাথ বলেন,—গোরক্ষনাথ যখন বৌদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল অনঙ্গবজ্র। কিন্তু আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তখন তাঁহার নাম রমণবজ্র। নেপালের বৌদ্ধেরা গোরক্ষনাথের উপর বড় চটা। উঁহাকে তাহারা ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে। মৎস্যেন্দ্রনাথের পূর্ব্বনাম মচ্ছঘ্নাথ, অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্ধদিগের স্মৃতিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যাহারা নিরন্তর প্রাণিহত্যা করে, সে সকল জাতিকে অর্থাৎ জেলে মালা কৈবর্ত্তদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে না। সুতরাং মচ্ছঘ্নাথ বৌদ্ধ হইতে পারেন না। কৌলদিগের সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থ আছে, তাহা পড়িয়া বোধ হয় না যে, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি নাথপন্থীদিগের একজন গুরু ছিলেন, অথচ তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা হইয়াছেন।

এইগুলি যে বাঙ্গালা, তাহা প্রমাণ করিবার আরও দুটি কারণ আছে। (১) একজন ফরাসীস্ পণ্ডিত তেঙ্গুরের ১০৮ হইতে ১৭৯ বাণ্ডিলে যত তন্ত্রের পুথি আছে, তাহার এক তালিকা দিয়া গিয়াছেন। ঐ তালিকায় গ্রন্থকারের নাম, তর্জ্জমাকারের নাম, অনেক স্থলে যে স্থানে বসিয়া তর্জ্জমা হয়, সেই স্থানের নাম এবং কয়েক স্থলে যাঁহারা এই তর্জ্জমা

শোধন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও নাম দিয়া গিয়াছেন। যে ফরাসীস্ পণ্ডিত এই তালিকাটি ছাপাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম P. Cordier—তিনি ফরাসডাঙ্গার ডাক্তার সাহেব ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি অনেক সময় আমার বাড়ী আসিতেন, আমিও অনেক সময় তাঁহার বাড়ী যাইতাম। তিনি এখান হইতে পণ্ডিচেরীর ডাক্তার সাহেব হইয়া যান, সেখান হইতে প্যারি নগরে কিছু কাল বাস করিয়া আবার পূর্ব্ব উপদ্বীপে ফরাসীদের যে রাজ্য আছে, তাহার ডাক্তার সাহেব হইয়া আসেন। অল্প দিন হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় ও তিব্বতীয় পুথিপাঁজির অনেক খোঁজ রাখিতেন। বৈদ্য-শাস্ত্রের পুথির উপর তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি প্রায় চারি পাঁচ শত বৈদ্য-শাস্ত্রের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তালিকাতে যত গ্রন্থকার, তর্জ্জমাকার, শোধক ও স্থানের নাম পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহার একটি অকারাদিক্রমে সূচী প্রস্তুত করিয়াছি ও এই পুস্তকের শেষে দিয়া দিয়াছি। * সে সূচীতে যাঁহাকে বাঙ্গালী অথবা বাঙ্গালা দেশের লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার যদি বাঙ্গালা সংকীর্ত্তনের পদ থাকে, সে পদ যে খাঁটী বাঙ্গালা, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া লইয়াছি। (২) পরে তাঁহার সেই পদগুলিতে যত শব্দ পাওয়া গিয়াছে, অকারাদিক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া সে কালের বাঙ্গালা ও এ কালের বাঙ্গালায় কি তফাৎ, তাহা দেখিয়া লইয়াছি। তাহাতে সে কালের বাঙ্গালার ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হইয়াছে। সেই ধারণা লইয়া অন্য যে সকল পদ পাইয়াছি, তাহারও অকারাদিক্রমে সূচী করিয়া লইয়া মিলাইয়াছি। তাহাতে যে সকল পদ বাঙ্গালা বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাকে বাঙ্গালা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই। একজন পদকর্ত্তার বাড়ী উড়িষ্যা দেশে, তাঁহার গানটিও উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাঙ্গালায় যেখানে ক্রিয়ার শেষে 'ল' থাকে, তাহাতে সেখানে 'ড়' আছে; যেমন 'গাহিল'—'গাহিড়'। সে পদটিকে আমি উড়িয়া ভাষার পদ বলিয়া স্থির করিয়াছি। এই রূপে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে ফল হইয়াছে, তাহাই এ পুস্তকে দিয়াছি। অকারাদি-ক্রমে প্রতি পদকর্ত্তার গানের প্রত্যেক কথার সূচী প্রস্তুত করিতে আমি দুই জন লোকের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। একজন শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার ভ্রমণকারী পণ্ডিত, আর সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানার মালিক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। বসন্ত বাবুর বয়স কত জানি না, কিন্তু তাঁহার দাড়ি সব পাকিয়া গিয়াছে; কিন্তু এ বয়সেও যেরূপ উৎসাহের সহিত সূচী প্রস্তুত বিষয়ে আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি পরিষৎ হইতে ছুটি লইয়া রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত আমার ওখানে কাজ করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায়, উড়িয়া, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার যে ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাতেও আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতেছি, তাহার মধ্যে চর্য্যাচর্য্য ও ডাকার্ণব নেপাল দরবারের। সে পুথি ছাপা হইবার পর তাঁহারা লইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া পুথির অনেকগুলি পাতা ফটোগ্রাফ করিয়া রাখিয়াছি এবং আমার পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি। অপর দুইখানি পুথি আমার নিজের অথবা নিজের হইতেও অধিক প্রিয়; কারণ, নেপালের পুথিখানার সুব্বা সাহেব বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারী আমাকে প্রীতি-উপহারস্বরূপ ঐ দুইখানি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা চব্বিশ পুরুষ ধরিয়া নেপালের মল্লরাজাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ শেষ নেওয়ার রাজার সহিত কাশীবাস করিয়া-ছিলেন এবং পরে গোর্খা পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা জঙ্গ বাহাদুরের সহিত এক পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর যখন ১৮৪৬ সালে কোতের হত্যাকাণ্ডের পর গোর্খারাজের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন,—"রাজতুম্হারি, হুকুম হমারী," তখন তিনি গোর্খারাজ্যে তাঁহার যে উচ্চ পদ ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া ঘরে গিয়া বসিলেন। জঙ্গ

* বর্ত্তমান সংস্করণে এই সুবৃহৎ "বৌদ্ধতান্ত্রিক-গ্রন্থকার-নাম-সূচী" অংশ বর্জ্জিত হইয়াছে।

বাহাদুর তাঁহাকে পুনর্ব্বার পদ গ্রহণ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই লইলেন না; বলিলেন,—"আমি নেওয়ারদের নুন খাইয়া গোর্খাদের সঙ্গে মিলিয়াছিলাম, যথেষ্ট পাপ হইয়াছে। এখন আবার গোর্খাদের নুন খাইয়া তোমার সহিত মিশিব না।" জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার পুত্রকে উচ্চ রাজপদ দিতে চাহিলে বিষ্ণুপ্রসাদ বলিলেন,—"যাহাতে অস্ত্র ধারণ করিতে হয়, এমন পদ আমি লইব না।" তাই তাঁহাকে পুথিখানার অধ্যক্ষ করা হয়। তিনি পুথিখানায় বসিয়া ক্রমাগত তন্ত্রের বহি পড়িতেন এবং তন্ত্রের অনেক খবর রাখিতেন। নেপালে যেখানে যে পুথি আছে, তাহা তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি একদিন কয়েকখানি প্রাচীন তালপাতার পুথি লইয়া আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ, আমার দেশে আসিয়াছ ও পুথি খুঁজিতেছ। তোমায় কি উপহার দিব, অনেক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া এই পুস্তক কয়খানি আনিয়াছি। আমি জানি, তুমি ইহার সদ্ব্যবহার করিবে।" আমি দেখিলাম, তাহার মধ্যে সরোরুহ বজ্রের দোঁহাকোষ ও তাহার অদ্বয়বজ্রের টীকা আছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, আপনার নিকট হইতে আমি আমার দেশের ইতিহাসের একটা প্রধান সরঞ্জাম পাইলাম,—আমি নিশ্চয় এটি ছাপাইব। ছাপাইয়া আমি যদি তাঁহাকে ইহার এক কপি দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু ঠিক দুই বৎসর হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কৃষ্ণাচার্য্যের দোঁহাকোষ ও তাহার টীকা, তাঁহারই উপদেশমত পুথিখানার লেখকেরা লিখিয়া আমায় উপহার দিয়াছিলেন, তাহাও আমি ছাপাইয়াছি। ইহার মূল পুথি এখন জাপানে আছে।

১৯০৭ সালে আমি নেপাল গিয়াছিলাম। তখন যে সকল পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহার একটা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তখনই আমি বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালা পুস্তকগুলি আমি ছাপাইব। ছাপাইতে বিলম্ব অনেক হইয়াছে। ইহাতে অনেক 'সাহিত্যামোদী' অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন; অনেকে বলিয়াছিলেন-"আমায় কেন দাও না, আমি ছাপাইয়া দিতেছি।" অনেকে বলিয়াছিলেন,—"শাস্ত্রী মহাশয় যক্ষের ধনের মত এই সকল অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছেন, কাহাকেও দেখিতে দিবেন না।" কিন্তু এই সকল ছাপাইতে যে কি পরিমাণ কাঠ-খড় দরকার, আমার মনে হয়, তাঁহারা তত জানিতেন না, তাই অত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অনেকে আছেন,—একটা নূতন কথা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ছাপাইয়া দিয়া নাম করেন। আমার সে প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি মনে করিয়াছিলাম, বরং ছাপাইব না, তথাপি তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিসটা নষ্ট করিব না। ভ্যাসিলিয়েফ বলিয়াছিলেন যে, অপভ্রংশ ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে। প্রোফেসর বেণ্ডল সুভাষিত-সংগ্রহ নামে একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে অপভ্রংশ ভাষার কতকগুলি দোঁহা ছিল। আমি দেখিয়াছিলাম, সে দোঁহাগুলি পুরাণ বাঙ্গালা। তাঁহারা দুজনেই বলিয়াছিলেন যে, তেঙ্গুরে এই সকল অপভ্রংশ পুস্তকের তর্জ্জমা আছে। কিন্তু ভুটিয়া শিখিয়া তেঙ্গুর পড়িয়া পুস্তক ছাপান আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। সুখের কথা, কয়েক বৎসর হইল, কর্ডিয়ার সাহেব ঠিক যে অংশে ঐ সকল পুস্তকের কথা আছে, তাহার তালিকা ছাপাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আমার বিস্তর উপকার হইয়াছে। এ তালিকা না পাইলে বোধ হয় আমার পুস্তক ছাপাইতে সাহস হইত না।

পুস্তক ছাপাইতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় আমার কোন কোন আত্মীয় মনে করিয়াছিলেন, টাকার জন্যই আমি পুস্তক ছাপাইতে পারিতেছি না। তাই তাঁহারা লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের নিকট এই পুস্তক ছাপাইবার খরচের জন্য বলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি রাজা বাহাদুরের অনুরাগ অসীম। তিনি শুনিবামাত্র

সাহিত্য-পরিষদে যে টাকা দিয়া থাকেন, তাহা হইতে উহার খরচ দিতে রাজী হন এবং উহা সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাবলীর মধ্যে লইবেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আবার এক গোল উঠিল। আমি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হইলাম। সভাপতি হইয়া সাহিত্য-পরিষদের খরচায় বই ছাপাইব, ইহা আমার ভাল লাগিল না। আমি রাজা বাহাদুরকে সে কথা জানাইলাম। তখন রাজা বাহাদুর স্বতন্ত্র ভাবে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিবেন এবং তাহার খরচ দিবেন, স্বীকার করিলেন। তিনি টাকা না দিলে এ পুস্তক এখন যে ভাবে ছাপা হইতেছে, এত ভাল কাগজে, এত ভাল, ছাপায়, এত বেশী ফটোগ্রাফ দিয়া, এত অনুক্রমণিকা দিয়া ছাপা হইত না। পুরাণ বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ সরঞ্জামে সদরে বাহির হওয়া উচিত, সেরূপ সরঞ্জাম আমার দ্বারা হইয়া উঠিত না। সুতরাং এই খরচ দিবার জন্য আমিও তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিব। বাঙ্গালা সাহিত্যও বোধ হয়, এ ঋণ শুধিতে পারিবে না। এ পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাবলীর ভিতর গণ্য হইবে।*

* [মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ., সি. আই. ই. সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' (দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৫৮) থেকে পুনর্মুদ্রিত।]